সোয়াদ

সোয়াদ

মূল : এরদোগান তুজান (তুর্কি)
আরবি অনুবাদ : রেফা মোহাম্মদ সালেহ

বাংলা রূপায়ণ
আবু তালহা সাজিদ

মাকতাবাতুল হাসান

সোয়াদ

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ২০১৯
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত
ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ।
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
বর্ণবিন্যাস : মুহিব্বুল্লাহ মামুন

ISBN : 978-984-8012-21-5

মূল্য : ২৬০/- টাকা মাত্র

Sowad
Translate by Abu Talha Sazid
Published by: Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail: rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

।। অর্পণ ।।

মারইয়াম, আইয়ান, নাদিফ, ইফতি, ইফতির আপু ও আমার অনাগত ভবিষ্যতের হাতে তুলে দিলাম এ ছোট্ট উপহার।

©

প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুবাদকের কথা	৯
সোয়াদ	১১
আমি হব সকাল বেলার পাখি	৩৩
কল্যাণকামী বন্ধু	৩৬
ওষুধ ও উপহার	৩৮
সম্মান ও শ্রদ্ধা	৪১
ভালো কথা বলার ভাষা	৪৪
আমরা সবাই ভাই-ভাই	৪৭
নিজেরটাতেই তুষ্ট থেকো	৫০
মন্দ নামে ডাকতে মানা	৫৩
স্বাক্ষরের মূল্য ভারি	৫৫
খুলে দাও জ্ঞানের দুয়ার	৫৮
বন্ধু তোমার বাড়ি কোথায়	৬২
যেমন কর্ম তেমন ফল	৬৪
কি বোকামি!	৬৭
অবশেষে পেলাম তারে	৭০
দর্জি	৭৩
দারোয়ানের পারিশ্রমিক	৭৫
আমার বন্ধু হাসান	৭৮
আমানত	৮১
চার্জ শেষ হওয়ার আগেই!	৮৪
চিন্তার লাভ	৮৬
আমার প্রথম রোজা	৯১
জায়নামাজ	৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
অতিকথার বিপদ	১০০
আংটি	১০৪
ভালোবাসার অশ্রু	১০৯
সংখ্যার গল্প	১১৩
মায়ের আদর	১১৬
হারানো বন্দুক	১২৫
সার্ভিসিং	১৩৩
শাকের চাচা	১৩৭
রক্তদান	১৪১
গুপ্তধনের চাবি	১৪৭
সদাচারে মন্দকে ভালো করে	১৫২
বরকত	১৫৬
প্রতিযোগিতা	১৬৪

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে সুন্দর 'গল্প' শুনিয়েছেন, যিনি তাঁর কালামে বর্ণনা করেছেন পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতদের নানা ঘটনা, যাতে মানুষ শিক্ষা লাভ করতে পারে। অসংখ্য দরুদ ও সালাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি শিশুদেরকে শুধু আদর- স্নেহই করেননি; বরং ঈমান-আমল এবং শিষ্টাচারিতাও শিখিয়েছেন।

* * *

শিশু মাত্রই গল্প শুনতে ভালোবাসে। ভালোবাসে গল্পের মাঝে হারিয়ে যেতে। সব শিশুর মতো আমিও গল্প শুনতে ভালোবাসতাম। ঋতু আপু, আমাদের বাড়ির কাঠমিস্ত্রি আব্দুল মান্নান কাকা, আনোয়ার ভাই; আরও অনেকের পেছনে লেগে থাকতাম একটি গল্প শোনার জন্য। যতদূর মনে পড়ে; ঋতু আপুর কাছ থেকে গল্প শুনেই বইয়ের নেশায় পড়েছিলাম। কত অলস দুপুর, বৃষ্টিভেজা দিন কেটেছে গল্প পড়ে। ছুটির দিনগুলোতে গল্পের নেশায় বুদ হয়ে থেকেছি বইয়ের পাতায়। কিন্তু ঈমান-আকিদা, শিষ্টাচার শিখতে পারি, এমন বই তখন পাইনি। বরং কিছু গল্পের মধ্যদিয়ে পেয়েছি 'অন্যকিছুর' পাঠ। সে পাঠ আজও দেওয়া হচ্ছে নানা চটকদার শিরোনামে। শৈশবেই আমাদের শিশুকিশোরদের চিন্তা-চেতনায় বুনে দেওয়া হচ্ছে ধর্মহীনতার বীজ। তখন গল্প পড়ে আনন্দ পেলেও এখন ভাবি, সেসময়ের উর্বর আমি অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম। আমার মনে হয়, আমার বয়সি দ্বীনপ্রিয় প্রতিটি পাঠকই কোনো একসময় এই শূন্যতা অনুভব করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! এই শূন্যতা পূরণ হতে শুরু করেছে। আদিব হুজুর, ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী, শরীফ মুহাম্মদ সাহেবের মতো মনীষীগণ মশাল হাতে এপথ চলতে শুরু করেছেন, এখনও চলছেন। তাঁদের দেখানো পথে অনেকেই চলার স্বপ্ন দেখছেন।

* * *

কয়েকজন ব্যক্তির কথা এখানে উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সহপাঠী ও সহকর্মী 'বন্ধু' নকীব বিন মুজীব। তাঁর

উৎসাহ প্রদান এই বইয়ের প্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার জীবনসঙ্গিনীকে। হঠাৎ ব্যস্ততায় পড়ে খাবিখাওয়া নির্ঝঞ্ঝাট মানুষটির জন্য তিনি প্রখর রোদ্রে শীতল পানি, একটুকরো মেঘ ও মৃদুমন্দ বায়ু হয়ে বিরাজ করছেন। এই বইয়ের প্রথম পাঠক হতে পেরে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন। স্নেহাস্পদ শরিফুল ইসলাম পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমার ছাত্রছাত্রী; বিশেষকরে আব্দুল্লাহ নোমানের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করছি। ওরা আমার লেখা পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা। আল্লাহ সবার চেষ্টা, ভালোবাসা ও আন্তরিকতাকে কবুল করুন। আমিন।

দোয়াপ্রার্থী
আবু তালহা সাজিদ
১৮/৩/২০১৯ইং
abutalhasazid@gmail.com

সোয়াদ

এখন শীতকাল। শীতকালে আমাদের দেশে দিনের পর দিন সূর্যি মামার দেখা মেলে না। চারদিক তুষারে ঢেকে আছে। আবহাওয়া বরফের মতো ঠান্ডা। হঠাৎ সূর্য ওঠে। মেঘের ফাঁক দিয়ে সোনালি রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের গায়ে। সমতল ভূমির উইলো গাছগুলো দিনভর বাতাসে দোল খায়। উইলোর ডালে জমে থাকা বরফগুলো ঝড়ে পড়ে টুংটাং শব্দে।

এমনি এক শীতের দিনে কর্কষ আওয়াজ তুলে একঝাঁক কাক উড়ে যায় ঘরবাড়ির উপর দিয়ে। রাস্তায় শুনশান নীরবতা। ঘরবাড়ির ছাদ থেকে ঝুলে থাকা বরফের ধারালো টুকরোগুলো শক্তভাবে আটকে আছে কার্নিশে।

কয়েকঘণ্টা আগে জোহরের ওয়াক্ত চলে গেছে। আসরের ওয়াক্ত ঘনিয়ে আসছে। বাসার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি আমি। হঠাৎ চোখ আটকে গেল আকাশের এক টুকরো কালো মেঘে। দেখতে দেখতে বিকেলের আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। মুহূর্তেই অন্ধকার হয়ে এলো চারপাশ। ঠান্ডা বাতাসের সাথে চারদিকে তুষার ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

মসজিদ থেকে আসরের আজান ভেসে এলো। এত শীত! হাড়েও যেন ঠান্ডা অনুভব করছি। বারান্দা থেকে শেষবারের মতো নদীর সামনের সমতল ভূমির দিকে তাকালাম। রুমে ঢোকার সময় আম্মু ফায়ারপ্লেস দেখে বললেন,

: রুম ঠান্ডা হতে শুরু করেছে। কিছু কাঠ নিয়ে আসতে হবে।

বেড়ালের মতো গুটিগুটি পায়ে ফায়ারপ্লেসের কাছে গেলাম। দেয়ালের পাশে রাখা বালিশে পিঠ ঠেকিয়ে বসলাম। শরীরে উষ্ণতার আবেশ ছড়িয়ে পড়তেই ঘুম চলে এলো। পা দুটো ছড়িয়ে একটু চোখ বন্ধ করলাম। ঘুমিয়ে পড়ার আগে দেখলাম, আম্মু জড়োসড়ো হয়ে বাইরে যাচ্ছেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম। কারও পায়ের আওয়াজ আর আম্মুর কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল।

আম্মু বলছিলেন,

: ওয়াআলাইকুমুস সালাম। আসুন, ভেতরে আসুন। মনে হচ্ছে খুব ঠান্ডা লেগেছে। আমি লাকড়ি আনার জন্য বাইরে যাচ্ছিলাম। আপনি বসুন, আমি কাঠ নিয়ে এক্ষুনি আসছি।

আব্বুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম তখন। আব্বু বললেন,

: আমিই নিয়ে আসছি। তুমি বরং তাড়াতাড়ি খাবার রেডি করো।

একজন অপরিচিত লোকের কণ্ঠও শুনতে পেলাম—

: আমাকে এক্ষুনি ফিরতে হবে। নাহলে বাসটা মিস করব...।

তার কথা শেষ করার আগেই আব্বু বললেন,

: রাশেদ সাহেব! এত তাড়াহুড়োর কী আছে? লম্বা জার্নি করে এসেছেন। অনেক কষ্টও হয়েছে বোধহয়। এইমাত্র আসরের আজান হলো। চলুন, একসাথে নামাজ পড়ে নিই।

আব্বুর কথা শেষ হওয়ার আগেই কারও কাঁপা কণ্ঠের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম...। আস্তে করে উঠে বসলাম। খোলা দরোজাটার কাছে যেতেই দেখলাম, একটা ছোট্ট মেয়ে আম্মুর সাথে রান্নাঘরে ঢুকছে। মেয়েটা যখন রান্নাঘরে ঢুকছিল, তখনও কাঁদছিল। হঠাৎ দেখলাম, একজন অপরিচিত লোক দরোজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। চেহারায় লজ্জার ছাপ ফুটে আছে। চোখের পানি লুকিয়ে মুচকি হাসলেন তিনি। তারপর বললেন,

: কেমন আছ বাবা?

এরমাঝে আব্বু বেশকিছু কাঠ বগলদাবা করে ফিরে এলেন। আমাকে দেখে বললেন,

: আব্বু, মেহমানদের ভেতরে নিয়ে যাও। দেখছ না, বাইরে ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি।

ড্রয়িংরুম পেরুনোর সময় আরেকবার রান্নাঘরের দিকে তাকালাম। তখনও রান্নাঘরেই বসে আছে মেয়েটা। গায়ের ওড়নাটা ছেঁড়া। চোখের পানিতে গালদুটো ভিজে আছে। চেষ্টা করেও ফোঁপানোর আওয়াজ লুকোতে পারছে না। মেয়েটা কাঁপাকাঁপা হাতে আম্মুর কাছ থেকে থালা-বাসনগুলো নিয়ে খাবার টেবিলে রাখল। তারপর আম্মু মেয়েটার হাতে রুটি আর এক টুকরো কাপড় দিয়ে বললেন,

: সোয়াদ! টেবিলটা মুছে এগুলো ড্রয়িংরুমে নিয়ে যাও।

মেয়েটির কান্না প্রায় থেমে এসেছিল। আম্মুর কথা শুনে মেয়েটি আবার কাঁদতে শুরু করল। আমি তখন একবার আম্মুকে আরেকবার মেয়েটিকে দেখছিলাম। কী হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আম্মু তখন ওর থুতনিতে ধরে মুখ উঁচু করলেন। তারপর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দিয়ে বললেন,

: কষ্ট পেয়ো না। এটা তো তোমারই বাড়ি।

কীহ্! ওর বাড়ি! ও আবার কে? ভ্রু কুঁচকে আরও ভালো করে তাকালাম।

একটু পর মেয়েটা ঝাড়ু নিয়ে আমার আশেপাশে পরিষ্কার করছিল। হঠাৎ ওর সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। ধমক দিয়ে বললাম,

: এই! দেখে কাজ করতে পারো না?

তখনও মেয়েটির কারও কথা শোনার মতো অবস্থা ছিল না। কারণ ও তখনও কাঁদছিল।

আব্বু অজু করার জন্য পাঞ্জাবির হাতা গোটালেন। আম্মু এসে বললেন:

: খাবার প্রস্তুত!

আব্বু বললেন,

: আগে নামাজ, নামাজ পড়ে তারপর খাব।

রাশেদ চাচাও হাতা গুটিয়ে আব্বুর কাছে জানতে চাইলেন, কোথায় অজু করবেন। আব্বু বাথরুম দেখিয়ে বললেন,

: এই যে রাশেদ সাহেব; এখানে। অজুর পানি গরম করে দিয়েছি।

রাশেদ চাচা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

মাশাআল্লাহ! আপনার ছেলে দ্রুত বড়ো হয়ে গেছে।

আব্বু বললেন,

: হুমম, সত্যিই বড়ো হয়ে গেছে। ও এখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। মোটামুটি পড়তেও পারে। কয়েকদিন পর আরও ভালো পড়তে পারবে ইনশাআল্লাহ।

আব্বুর কথা শুনে খুব খুশি হলাম। ফায়ারপ্লেসের পাশে আব্বু জায়নামাজ বিছিয়ে দিলেন। রাশেদ চাচা বললেন,

: তুমিও অজু করে আমাদের সাথে নামাজ পড়ে নাও। মোজা খোলার সময় রান্নাঘরের দিকে তাকালাম। সোয়াদ তখনও কাঁদছে। আমি তখনও জানতে পারিনি, সোয়াদ কাঁদছে কেন। নামাজের পর সবাই চুপচাপ দস্তরখানে বসে পড়ল। রাশেদ চাচা আর তার মেয়ে অতিকষ্টে খাবার খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তাদের কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

খাওয়া-দাওয়া শেষে আম্মু দস্তরখানা উঠিয়ে নিলেন। সোয়াদ তার বাবার পাশে গিয়ে বসল। দুজনই মাথা নিচু করে বসেছিল। যত সময় যাচ্ছিল, আমার মনে হচ্ছিল, রাশেদ চাচা মনে হয় বাসটা মিস করবেন।

রাশেদ চাচাকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি উঠতে চাচ্ছেন, কিন্তু কোনো কারণে উঠতে পারছেন না। একটু পর বললেন,

: ইয়ে..আলী সাহেব! আমি এখন উঠি। বাস ধরতে হবে।

রাশেদ চাচার কথা শুনে সোয়াদ চিৎকার করে বলতে লাগল,

: না আব্বু, আমাকে রেখে যেয়ো না। আব্বু...

সোয়াদ রাশেদ চাচাকে জড়িয়ে ধরে তারস্বরে কাঁদতে লাগল। রাশেদ চাচা অস্পষ্টভাবে বললেন,

: মা...আমি...!

আম্মু আলতো করে সোয়াদের হাত ধরে বেডরুমে নিয়ে গেলেন। আব্বু রাশেদ চাচাকে বললেন,

রাশেদ সাহেব! চিন্তা করবেন না। আমি ওকে আমার ছেলের মতোই দেখে রাখব।

রাশেদ চাচা সোফার উপর থেকে তার টুপিটা নিয়ে মাথায় দিলেন। টুপিতে কান পর্যন্ত ঢেকে গেল। চাচার গাল বেয়ে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। ঠান্ডায় জলগুলো জমে গিয়েছিল। আব্বুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,

এ বছর খুব ঠান্ডা পড়েছে। আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ মজুত নেই। কী করব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। তখন আপনার কথা মনে পড়ল। কী করব বলুন, অভাব মানুষকে নিরুপায় করে দেয়।

তারপর আব্বুকে বললেন,

: জাযাকাল্লাহু খায়রান। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আব্বু রাশেদ চাচার কাঁধে হাত রাখলেন। আমি দেখলাম, আব্বুর গাল বেয়েও অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আব্বু বললেন,

: রাশেদ সাহেব! চিন্তা করবেন না। আগামীবছর সোয়াদকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেব।

আব্বুর কথা শুনে রাশেদ চাচার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চাচা বললেন:

সত্যিই ওকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবেন?

: হ্যাঁ রাশেদ সাহেব! ইনশাআল্লাহ, ওর জন্য যা করা দরকার সব করব। সোয়াদ আজ থেকে আমারও মেয়ে।

: সোয়াদ তো বেশ বড়ো হয়ে গেছে। এখানে স্কুলে গিয়ে যদি কিছু শিখতে পারে, তাহলে আর আমার মতো নিরক্ষর থাকতে হবে না।

আব্বু আর রাশেদ চাচা উঠে দরোজার দিকে এগিয়ে গেলেন। রাশেদ চাচা স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছিলেন। আব্বুর সাথে নিচুস্বরে কথা বলছিলেন তিনি। তারপর দরোজার পাশ থেকে ব্যাগটি নিয়ে আব্বুকে দিয়ে বললেন,

: এটা ওর ব্যাগ।

ব্যাগের ফাঁক দিয়ে পুতুলের কাপড় দেখা যাচ্ছিল। ব্যাগটা নিয়ে আমি রুমে রেখে দিলাম। আব্বু আর রাশেদ চাচা বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। বেডরুম থেকে সোয়াদের ফোঁপানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কী করব, বুঝতে পারছিলাম না।

বেডরুমের দরোজা বন্ধ হয়ে গেল। ভেতর থেকে তখন মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর সজোরে দরোজাটা খুলে গেল। সোয়াদ দৌড়ে বের হয়ে এলো বেডরুম থেকে। চিৎকার করে বলতে লাগল,

: আব্বু! আব্বু! আমাকে রেখে যেয়ো না। আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও...

আম্মু ওকে ধরে রাখতে পারলেন না। ও দৌড়ে রাশেদ চাচার দিকে যেতে লাগল। ড্রয়িং রুম পেরুনোর সময় সোয়াদ আব্বুর সাথে ধাক্কা খেল। আব্বু শক্তকরে সোয়াদের হাত ধরলেন। সোয়াদ তখন বাইরে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করছিল। ঝাঁকুনি লেগে ওর চুলের বাঁধন খুলে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সোয়াদ শান্ত হলো। আব্বু ওকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। তারপর আদর করে বললেন,

কেঁদো না মা, তোমার আব্বু কদিন বাদেই তোমাকে দেখতে আসবেন।

আম্মু সোয়াদের হাত ধরে ওকে কোলে তুলে নিলেন। চুলগুলো গুছিয়ে দিয়ে মায়াভরে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন,

: এসো আম্মু, তোমার হাতমুখ ধুয়ে দিই। তারপর আমরা সবাই মিলে গল্প করব।

আম্মু সোয়াদকে নিয়ে বাথরুমে গেলেন। আব্বু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর চোখ মুছে বললেন,

: এখন থেকে সোয়াদ আমাদের সাথে থাকবে। আজ থেকে তুমি ওর ভাই। কেমন?

* * *

শীতের এক দীর্ঘ রাত শুরু হলো। বাইরে সবকিছু ঢেকে যাচ্ছে তুষারে। আগে যখন জানালার পর্দা ওঠাতাম, যতদূর চোখ যায়, সারিসারি শুকনো নাশপাতি, পীচ, আর তুতগাছ চোখে পড়ত। এখন হয়তো গাছের কঙ্কাল চোখে পড়বে, না হলে দেখা যাবে সবুজ গাছ তুষারে শুভ্র হয়ে আছে।

তীব্র শীতের সাথে যোগ হয়েছে রাতের নিকষ কালো অন্ধকার। বাইরে তাকালেই ভয় ধরে যায় মনে। তাড়াতাড়ি জানালার পর্দা নামিয়ে আমার রুমে চলে এলাম।

সোয়াদ সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটাল। রাতের খাবারের পর আব্বু চমৎকার একটি গল্প শোনালেন। গল্পের মাঝে আম্মু বললেন,

: আপাতত সোয়াদ আহমাদের রুমেই ঘুমাতে পারে, কী বলো?

আমার একটু তন্দ্রাবেশ ভাব এসেছিল। আম্মুর কথা শোনার সাথে সাথে ঘুম চলে গেল। আমি বললাম,

: আমার রুমে! না, আমি আমার রুমে কাউকে থাকতে দেব না।

আব্বু গল্প বলা বন্ধ করে আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আসলে সোয়াদকে দেখে ভালো বলেই মনে হচ্ছিল, কিন্তু আমি ওকে পছন্দ করতে পারছিলাম না। কারণ ও আমার সবকিছুতে ভাগ বসাতে শুরু করেছে।